লালন ফকির ও কতিপয় গুরুতর প্রসঙ্গঃ – *Lalon Fakir from islamic point of view*

October 16th, 2012 | Add a Comment

শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবীতেই কবিতা লেখার কাজটিকে প্রীতির চোখেই দেখা হয়। যদিও এই দেখার মধ্যে সর্বদা যে প্রীতিই প্রতিভাত হয় তা নয়, অবজ্ঞা, করুণা ও কৌতুকও মিশ্রিত থাকে। অর্থাৎ কবিরা নিজে যাই ভাবুন, বিদগ্ধ সাহিত্যপ্রেমীরা যাই বলুন- এটা সত্য যে, কবিদের সামাজিক মূল্য বিশেষ আশাপ্রদ নয়, উল্লেখযোগ্যও নয়। নোবেল পুরস্কার পেয়ে কেউ কেই আকস্মিকভাবে ধনাঢ্য ও জগদ্বিখ্যাত হয়ে যান বটে, কিন্তু সে নিতান্তই ব্যতিক্রম। অধিকাংশ কবিই আমৃত্যু এক ধরণের অবহেলার মধ্যেই জীবন যাপন করেন। অবশ্য একালের কবিরা যেহেতু একটু চতুর প্রকৃতির, তাঁরা কবিতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকেও যথোচিত মনোনিবেশ করেন। তাঁরা যুগপৎ শিক্ষিত, সংস্কৃতিসেবী-ব্যবসায়ী এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চর্তুদিকে সততই এমন অনুগত লাটিমের মত ঘূর্ণায়মান যে, তারাও বহু সভায় সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসন প্রায়শ অলংকৃত করেন। কিন্তু সবাই জানে, তাঁরা নিজেরাও জানেন, এই সম্মান ও প্রতিষ্ঠার মূলধন কবিতা নয়, চাটুকারিতা ও ক্ষমতাবানদের সম্মুখে নতজানু হয়ে নিজেকে এক সহজ দ্রবণে পরিনত করার অসামান্য দক্ষতা এবং যে কবি যত চাতুর্যের সঙ্গে এই দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেন, তিনি তত বড় কবি। কবিরা এ কথায় উষ্মা প্রকাশ করতে পারেন কিন্তু কথা সত্য।

অবশ্য চিরকাল এমন ছিল না।বিদূষক ধরণের রাজকবি চিরকালই ছিল, কিন্তু তার বাইরের কবিতার প্রতি সত্ ও বিশ্বস্ত এমন অনেক কবিও ছিলেন যারা কারো মন রক্ষার কথা না ভেবে এক সঙ্গে নিজস্ব আবেগে ও অনুরাগে ফুলে ফুলে উঠতেন। এরকমই একজন আত্নমগ্ন, সামাজিক স্বীকৃতির প্রতি সর্বাংশে ভ্রুক্ষেপহীন, একান্ত আবেগে আন্দোলিত একজন লোককবির নাম লালন ফকির। কেউ কেউ বলেন 'সাঁইজী' । তবে 'সাঁই' বা 'ফকির' যাই হোক, লালন যে বাউল পদরচনায় অমিত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁর গানের আকর্ষণ যে খুবই দুর্বার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু লালনকে নিয়ে অন্য সমস্যা আছে; এবং সমস্যা একটি নয়, একাধিক। এখনো যে একটি বিষয়ের মিমাংসা হলো না, তাহলো লোকটি জন্মসূত্রে কী ছিলেন, হিন্দু না মুসলমান? নানা রকম তর্ক বির্তকের পর এখন অবশ্য মুসলমান বলেই মনে করা হচ্ছে। যারা তাকে হিন্দু বলে বিশ্বাস করেন, ক্লান্তি ও অনীহাবশত তারা এখন অনেকটাই নীরব। লালন যে সকল গবেষকের কাছে মুসলমান তারা লালনের জন্মস্থান হরিশপুরসহ পিতামাতা, আত্নীয়-পরিজনের পরিচয়ও নির্ভূলভাবে চিহ্নিত করেছেন। লালন নিজে অবশ্য নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেন নি, এমনকি ভুলক্রমে গানের কোথায়ও কোনরুপ পরিচিতি প্রকাশ হয়ে পড়ে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন।

অর্থাৎ খুব সচেতনভাবেই লালন তার ধর্ম ও জন্মগত পরিচয় গোপন করেছিলেন। গবেষকদের চিন্তাভাবনার পরিসরও বড়, রহস্যভেদী দুরদর্শিতাও অপরিসীম। তাদের কারও সাথেই কোন তর্কে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছে নেই, শক্তিও নেই। অতিশয় ক্ষীণকন্ঠে একটি প্রশ্ন উথাপন করতে চাই, প্রাণদন্ডে দন্ডিত কোন খুনী বা বড় ধরণের কোন দস্যু-তস্কর ছাড়া কোন মুসলমান কি কখনো আত্নগোপন করে? তার তো জাতি ধর্ম নিয়ে কোন ভয় নেই, হীনমন্যতাও নেই, বিনা কারণে সে কেন জন্ম ও ধর্ম পরিচয়কে সর্বদা আড়াল করে রাখবে? সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে এই ধরণের গান লেখার জন্য রহস্যময় আবরণ সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজন হয় না; সব ধর্মকেই অস্বীকার করাই যথেষ্ট অথবা সব ধর্মকেই আপন ভেবে সর্বপ্রেমী ধর্ম নিরপেক্ষ হলেই যথেষ্ট। আসলে লালনের এই ধরণের আত্নগোপন ইচ্ছেকৃত নয়, বাধ্যতামূলক।

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের কথাই সর্বাংশে সঠিক, লালন ছিলেন জন্মসূত্রে একজন কায়স্থ হিন্দু এবং তার জন্মস্থান ছিল কুমারখালীর অপর পারে গড়াই নদী তীরবর্তী ভাঁড়রা গ্রামে। বর্তমান নিবন্ধকারের যুক্তি, লালনের সমসাময়িক হিন্দু সমাজ ছিল অত্যন্ত কঠোর। ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক লালন মুসলমান পরিবারে অবস্থানসহ ‘অন্নজল’ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাঁড়রায় ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন, তিনি কঠিনভাবে সমাজচ্যুত। হয়ত প্রায়শ্চিত্তের কোন ব্যবস্থা ছিল কিন্তু স্ব সমাজের প্রতি প্রচন্ড ঘৃণা ও ক্ষোভে এবং অভিমান নিয়ে লালন ফিরে এলেন ছেঁউড়িয়ায় তার মুসলমান আশ্রয়দাত্রীর কাছে। সমাজ

তাকে প্রত্যাখ্যান করলো। তিনিও রক্ত-ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পরিণত হলেন এক নবজাত-লালনে। যৌক্তিক দিক থেকে জন্ম পরিচয়হীন এই ধরণের আত্মগোপনতাই স্বাভাবিক বলে ধারণা করা হয।

আর তিনি যদি মুসলমান হতেন এবং তার জন্মস্থান হতো হরিশপুর, তিনি চাইলেও তার পরিচয় তিনি আড়াল করে রাখতে পারতেন না। তিনি জীবদ্দশায়ই বিখ্যাত; এবং তার ছেঁউড়িয়াস্থ আখড়া থেকে হরিশপুরের দুরত্ব এমন বেশী নয়। হরিশপুর থেকে কেউ না কেউ নিশ্চয়ই বলতো-এ লালন আমাদেরই সন্তান। কিন্তু না, তার দীর্ঘ জীবনে এমন কথা কেউ কখনো বলে নি। অতএব দু' একজন উপাধি লিপ্সু গবেষক যত যাই বলুন, যত দলিল প্রমাণই উপস্থাপন করুন, বিশ্বাস করা খুবই কষ্টকর যে, লালনের বাড়ি ছিল হরিশপুর এবং তিনি মুসলিম সন্তান। যে এক কলমিপুঁথির অবলম্বণে লালনকে মুসলমান বানানো হয়েছে, খুবই রহস্যময় ও কৌতুককর যে সেই পুঁথিটিও কোন এক সর্বনাশা অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে গেছে; এখন একটি নকল পুঁথিই সম্বল। কিন্তু আসলটা যখন অক্ষত ছিল তখন আরেকটি নকল লেখনের কী প্রয়োজন ছিল? তারপর মূলকপিটি যখন পুড়েই গেল, হুবহু দ্বিতীয় একটি কপি তৈরী হলো কি করে? পুরো ব্যাপারটাই কোন মতলবী-নাটক নয় তো? বিশেষ করে পুঁথি বিশেষজ্ঞরা যখন ভাষা শব্দ ও অন্যান্য বিচারে উপস্থাপিত এই নকল কপিটিকে ঘোরতরভাবে সন্দেহ করেন, তখন আমাদের মত মুর্খজনেরা ভাবতে বাধ্য হয় যে, আমাদের কতিপয় উপাধিলোভী গবেষক গবেষণার চেয়ে নাটক রচনাতেই বেশী পারঙ্গম।

বলা আবশ্যক, আমার নিজের নানা কারণে আমার মধ্যে লালনের প্রতি কিছু অনুরাগ জন্মেছিল, সেই সূত্রে তার জীবন ও শিল্পকর্ম সম্পর্কে কিছু চিন্তা-ভাবনাও করেছিলাম। আমার মনে হয়েছে, আমাদের মধ্যে একজন মাত্র আছেন যিনি লালন গবেষণায় নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী, তিনি ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী। তাছাড়া অধিকাংশই পূর্ব ধারণা ও মতলবী-উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত। তবে সুখের বিষয় আলোচ্য সমস্যাটি একটি অতিশয় লঘু সমস্যা। এ নিয়ে কেউ কেউ জীবনপাত পরিশ্রম করলেও করতে পারেন কিন্তু এতে মেধা ও মনীষার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। লালন হিন্দু ছিলেন না মুসলমান ছিলেন, এ বিষয়ে সাধারণ জনমনে যদিও

কিছুটা কৌতুহল আছে, কিন্তু এই অনাবশ্যক লঘু-কৌতুহল আদৌ গুরুত্বপূর্ণ নয়; এবং এতে বিশেষ কিছু এসেও যায় না।

লালনকে নিয়ে দ্বিতীয় একটি সমস্যা আছে, যা শুধু প্রবল কি প্রকট নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে। কেউ কেউ লালনকে বলেন, আউলিয়া। খুবই বিপদ যে, এই ধরণের গবেষকদের প্রলাপোক্তির কোন সীমা পরিসীমা নেই। যে ব্যক্তি জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়েন নি, একটি রোজা রাখেন নি, যিনি চৈত্র-মাসের দোল পূর্ণিমাকে গ্রহণ করেছেন তার বাৎসরিক পূণ্যযজ্ঞের মাহেন্দ্র রজনীরূপে, যিনি যাপন করেছেন ইসলামের সঙ্গে গুরুতরভাবে সম্পর্করিক্ত এক মুশরেকী জীবন, যার শিষ্য প্রশিষ্যদের আধ্যাত্মিক সাধনার শ্রেষ্ঠতম অনুপান গঞ্জিকা(গাঁজা)- তিনিও একজন আউলিয়া। আউলিয়াই বটে। কোন কোন গবেষকের প্রেম ও কল্পনা শক্তি যে সত্যই বড় প্রবল, এটা তারই প্রমাণ।

জন্মসূত্রে লালন কী ছিলেন এ নিয়ে কিছু সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তার জীবনাচারে যে ইসলাম ও মুসলমানিত্বের গন্ধমাত্র ছিল না, এটা তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। তবু তাকে আউলিয়া দরবেশ অভিহিত করে কিছু কিছু গবেষক কী যে তৃপ্তি ও সুখ ও ফায়দা লাভ করেন, আল্লাহপাক জানেন। এবং পন্ডিতজনেরা কিন্তু যথেষ্ট সাফল্যও লাভ করেছেন; কারণ অবস্থা অতিদ্রুত এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যে, গঞ্জিকাপায়ী সংসার পলাতক কিছু লালনভক্ত শুধু নয়, বহু সাধারণ মুসলমানও বিশ্বাস করে, লালন একজন খুবই বড় মাপের আউলিয়া ছিলেন। বদনসীব, বাঙ্গালী মুসলমানদের সত্যই বড় বদনসীব।

বর্তমান লালনপ্রেমীদের খুব কষ্ট হবে, তবু দু একটি বিষয়ে আলোকপাত করা বিশেষ জরুরী। প্রকৃত পক্ষে লালনের যথার্থ পরিচয় অতভাবে বিধৃত হয়ে আছে তার সমসাময়িক ও তৎপরবর্তী প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর ইতিহাস এবং তার গানের মধ্যে। লালনকে নিয়ে ইতিহাস বিকৃতি শুরু হয়েছে পাকিস্তান আমলে ১৯৬৫ সালের পর। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতিপ হিসেবে দাঁড় করানোর একটি নিরর্থক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যলালিত লক্ষ্য নিয়েই এই বিকৃতি প্রক্রিয়ার শুরু। এবং আজকের আমরা যে লালনকে দেখতে পাচ্ছি, সেটা অংশত ওই প্রক্রিয়ারই

পরিণতি। তবে বর্তমান প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনার বেশী অবকাশ নেই কারণ বর্তমান লেখাটির প্রতিপাদ্য একটু ভিন্ন।

লালন কিভাবে ও কতখানি বিপজ্জনক ছিল এবং এখনো যে বিপদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সমস্যাটি তুলে ধরাই বর্তমান আলোচনার মূল লক্ষ্য। সমস্যাটা হলো, লালন মুসলমান ছিলেন না মুমেনও ছিলেন না এবং আউলিয়া হওয়ার তো কোন প্রশ্নই উঠে না; অথচ এই সকল অভিধায় আজ তাকে অভিহিত করা হচ্ছে। যার মধ্যে সামান্যতম ঈমান আছে, ইসলামের জন্যে নিভূ নিভূ হলেও কিছুটা অন্তত প্রীতি আছে, তার পক্ষে এসব অকথ্য মিথ্যাচার সহ্য করা কষ্টকর।

লালনকে এখন আদর করে বলা হয় বাউল সম্রাট। আমাদের কোন আপত্তি নেই; আমরা বরং এই ভেবে খুশীই যে, আমাদের এই দরিদ্র দেশে এমন একজন সম্রাটের জন্ম যার গানের ছত্রছায়া এখনো আমাদের উপর ছায়া বিস্তার করে আছে। কিন্তু কেউ অস্বীকার করেন না, করতেও পারেন না যে, অদ্যকার এই বাউল সম্রাট তার স্বসময়ে এবং পরবর্তীকালেও অনেকদিন পর্যন্ত বেশরা ন্যাড়ার ফকির বলেই আখ্যায়িত হয়ে এসেছেন। এবং আজ যাকে বলা হচ্ছে মাজার; কিছুদিন মাত্র আগেও তার নাম ছিল লালনের আখড়া; আর ঝোপজঙ্গল পরিকীর্ণ সেই আখড়াটি ছিল গঞ্জিকাসেবী-প্রেমী রসিকজনের নিরিবিলি আশ্রয়স্থল। এই আখড়াই পরিবর্তিত বর্তমান রূপ হলো লালন শাহের মাজার।

সরকারী পৃষ্টপোষকতা ও অন্য অনেক কারণে ইতোমধ্যে এই মাজার-এর একটি অপরিহার্য প্রভাব বলয়ও তৈরী হয়েছে, যে কারণে দুরদুরান্ত থেকে ডুগি-একতারা ও গাঁজার কল্কি নিয়ে ‘সাধক পুরুষেরা’ তো আসছেনই, শীরনি-মানতসহ বহু সরল প্রাণ মুসলমানও আসছে এই মাজার জিয়ারত করতে। এটা একটা ফিতনা এবং এমন ফিতনা যার কারণে বহু ঈমান নষ্ট হচ্ছে। বলাই বাহুল্য’, লালনের আখড়া কেন্দ্রিক এই ফিতনাটি একেবারে নতুন নয়, তিন সাড়ে তিন দশক আগে এই বিপদের আরম্ভ এবং তারপর থেকে ক্রমাগতই এই ফিতনা প্রবল হয়ে উঠেছে। অথচ সকল সরকার ও সকল সচেতন মানুষের একথা বলা উচিত ছিল-যত বড়

আউলিয়াই হোন তার মাজারে গিয়ে কোন কিছু প্রার্থনা করা সুস্পষ্ট শির্ক। অতএব, নিষিদ্ধ; আর এটা তো কোন মাজারই নয়, এটা একজন বাউল গীতিকারের সমাধিত্রে। বিশেষ করে আমাদের আলেম উলামাদের প থেকে এ কথা উচ্চারণ করা খুবই জরুরী ছিল, কারণ এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু না, তাঁরাও কিছু বলেন না। সম্ভবতঃ বলেন না তার কারণ, তাদের অধিকাংশেরই এমন অবস্থা যে, দোয়ার মাহফিলে ওয়াজ করতে করতেই তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েন। সামান্য যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট থাকে, তা তারা তসলিমা নাসরিন নামক এক বিপ্তিচিত্ত বালিকা ও কতিপয় মুরতাদ বুদ্ধিজীবিদের বিরুদ্ধে নাটুকে লড়াইয়ের মধ্যেই নিঃশেষ করে ফেলেন। অবশ্য এটি ভিন্ন আলোচনার বস্তু, লালন প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

আমাদের কাছে এটা দুর্বোধ্য যে, লালন যা নয় তা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠা করতে কিছু মানুষের এত উৎসাহ কেন? আবহমান বাংলা গানের ইতিহাসে লালন যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এ নিয়ে কোন মতবিরোধ নেই; এবং শ্রোতারা তার গানে যদি আনন্দে আন্দোলিত হয় সেখানেও কিছু বলার নেই। কারণ তার সুর ও বাণীর মধ্যে এমন এক ধরণের নান্দনিকতা আছে, যা চিরকালই সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষকে কম-বেশী আকর্ষণ করবেই। কিন্তু এটা তো মনে রাখা উচিত যে, তিনি না কোন দরবেশ এবং তার গান না এতটুকু ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নামাজ রোজা রাসুল ইত্যাদি ধরণের কিছু ইসলামী শব্দ ও দু একটি ইসলামসম্মত পক্তি দেখে কেউ কেউ বিপুলভাবে উৎসাহিত হতে পারেন, কিন্তু বস্তুত তার গানের পুরো আবহই যে ইসলামী আকীদার পরিপন্থী, এ কথা না মানার কোন যুক্তি নেই, কোন উপায়ও নেই। দু একটি মাত্র উদারহণ পেশ করলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, লালন আসলেই কি পরিমাণে ইসলামের সম্পূর্ণ বর্হিভূত এক বেশরা জিন্দিক।

আপনি খোদা আপনি নবী,

আপনি হন আদম সফি

অথবা,

আল্লাহ নবী দুটি অবতার,

গাছ বীজ দেখি যে প্রকার

কিংবা

যে মুরশিদ সেই তো রাসুল, ইহাতে নাই কোন ভূল, খোদাও সে হয়-

এই সকল গান কী প্রমাণ করে? প্রমাণিত হয়, ইসলামের মৌলিক ও অলঙ্ঘ্য দাবি যে তওহিদ, সেই তওহিদের সরাসরি মোকাবিলায় দন্ডায়মান লালন এক কুশলী কবি তীরন্দাজ। তার গান শুনতে যতই মধুরই হোক, তাৎণিক আবেদন হোক যতই মর্মস্পর্শী, আসলে এই গান মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা বিধ্বংসী এক একটি দুর্বার মারণাস্ত্র। অথচ কী বদনসীব আমাদের, এমন ঈমানবিনাশী মারণাস্ত্র নির্মাতাকেই আমরা বলছি সুফী দরবেশ আউলিয়া এবং কখনো কখনো বলছি মারেফাতের নিগূঢ় রহস্যভেদী এক ইনসানে-ই-কামেল। কালেমই বটে, না হলে এই কথা কি আর যে কেউ গানে বাধতে পারে-

এক এক দেশের এক এক বাণী,

পাঠান কি সাঁই গুণমনি,

মানুষের রচিত বাণী লালন ফকির কয়।

এমন ইসলাম দরদী কামেল পুরুষ ছাড়া কে আর এমন করে বলতে পারে-

কে বোঝে তোমার অপার লীলে,

তুমি আপনি আল্লাহ ডাকে আল্লাহ বলে।

তুমি আগমেরই ফুল নিগমে রসূল,

এসে আদমের ধড়ে জান হইলে।

কী গর্হিত ও ভয়াবহ উক্তি! রাসূলকে আল্লাহ এবং আল্লাহকে রাসূল মনে করার এই জঘন্যতম আকীদা ইসলামের মূলে কুঠারাঘাত করারই অপচেষ্টা। লালন ফকিরের এই এক ধরণের গান, যেখানে তওহিদ-রেসালাত, কোরআন সুন্নাহ ইসলামের মূল আকীদা বিশ্বাস সবকিছুকে অস্বীকার করে, এক জাতীয় কুহকভরা মরমিয়া নান্দনিকতার মোড়কে এমন সব কথা বলা হয়েছে যা রীতিমত শিরক-কুফর নিফাক ও গোমরাহীর চূড়ান্ত। আফসোস, যা কিছু উৎখাত করবার জন্য এই ধরাপৃষ্ঠে ইসলামের আগমন, লালনের গানে সেই সকল নিষিদ্ধ বিষয়ই বার বার বাঙময় হয়ে উঠে; এবং আরো আফসোস যে, সেই সকল দুর্বাক্যপূর্ণ গান সসম্মান প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, লালনের বহু গান আমি প্রায় শল্যচিকিৎসকের মতো ব্যবচ্ছেদ করে করে দেখেছি; সেখানে আর যাই হোক, ইসলামের নামগন্ধও নেই। বরং যা আছে, তা মুসলমানের ঈমান ও আকীদার জন্য এতোই ভয়ংকর যে, তার প্রতি যৎসামান্য দুর্বলতা পোষণ করলেও নিশ্চিতভাবে মুশরিক ও মুনাফিকদের দলভূক্ত হয়ে যেতে হয়। অবশ্য তারপরও আমি সর্বাংশে আমার নিজস্ব বিবেচনার ওপরই নির্ভর করি নি; বিশিষ্ট গবেষক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী আমাকে অনেক বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছেন। ডঃ চৌধুরী লালনের প্রতি সবিশেষ অনুরাগী; এবং তার অনুরাগ এতটাই প্রবল যে, বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত তার 'লালন শাহ' গ্রন্থে তিনি প্রথমে যে লেখকের নিবেদন পেশ করেছেন, সেই নিবেদন তিনি শেষ করেছেন আলোক সাঁই শব্দবন্ধটি দিয়ে।

কুষ্টিয়ার অত্যন্ত বনেদী ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মেধাবী এই নিরর্থক লালনভক্তি আমাকে পীড়িত করে, কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ। ডঃ চৌধুরী যেটা প্রীতিকর ও প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য তা হলো কোন অনুরাগ বা কোন ক্ষতি-বৃদ্ধির আশংকাবশত তিনি কখনো সত্যকে আড়াল করতে প্রলুব্ধ হন না। আমি তার দ্বারা বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছি; অনেক সত্য কথা তিনি এমন

অকপটে আমাকে জানিয়েছেন, যার দ্বারা থিকথিকে লালনপ্রীতির বিপজ্জনক দংশন থেকে বহু মুসলমানের জন্য আত্নরক্ষার একটা পথ তৈরী হতে পারে। আল্লাহপাক আবুল আহসান চৌধুরীকে অন্তত এই কাজটির জন্য হলেও পার্থিব ও পারলৌকিক কামিয়াবী দান করুন, এই দোয়া করি।

লালনকে যারা মারেফাতের উচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত একজন আউলিয়া বলে বিবেচনা করেন, তাদের জ্ঞাতার্থে লালনগীতির কিছু পংক্তি তুলে ধরলেই বিষয়টি পরিস্কার হয়ে যায় যে, তিনি ইসলামের পৃষ্টদেশে ছুরিকাঘাতে ওস্তাদ এমন এক নিপুণ ও মারাত্নক আউলিয়ারুপী আততায়ী, যার কাছে এমনটি নবুয়তের নোংরা দাবিদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও যথেষ্ট ছেলে মানুষ। অবশ্য লালন যদি রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল কি অতুল প্রসাদের মতো শুধুই কবি বা সঙ্গীতকার হতেন, কিছু বলার ছিল না। কারণ, অতি নগণ্য ব্যতিক্রম ছাড়া, গান তো তার স্বভাবী নিয়মেই মানুষকে অল্পাধিক তিগ্রস্থ করে। এবং প্রায়শ যেহেতু আমাদের লাভ ক্ষতির হিসাবের মধ্যে যথেষ্ট গরমিল বিদ্যমান, শৈল্পিক সুষমা ও নান্দনিকতার নামে এই ক্ষতি আমরা অনেকে মেনেও নিয়েছি।

কিন্তু লালন যেহেতু গানের আড়ালে মুসলমানদের পার্থিব ও পারলৌকিক সর্বনাশ সাধনে এক বিশুদ্ধ ইবলিসি পথের রাহবার, ইসলামের তাওহীদি ঐশ্বর্যের এ ঘোরতর দুশমন, ইসলামের সকল নীতি ও নৈতিকতাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নোংরা নর্দমা সৃষ্টির রুপকার, তার মুখ ও মুখোশের পরিচয় তুলে ধরা তাই একটি জরুরী কাজ। অবশ্য আল্লাহপাকের ঘোষণা, যারা অন্ধ, মূক ও বধির যাদের বস্থিত কলব একেবারে মৃত-তারা আর ফিরবে না। কিন্তু অনেক মুসলমান তো এমনও আছে, যারা অসতর্কতাবশত ভুলক্রমে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত, তাদের পক্ষে লালনের গর্হিত সম্মোহন ছিন্নকরত ইসলামের কাছে ফিরে আসা অসম্ভব নয়।

লালন যে সত্যই কত বড় আউলিয়া তার কিছু পরিচয় বিখ্যাত পংক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। অনাদির আদি শ্রীকৃষ্ণ নিধি, আর কি গৌর আসবে ফিরে, গোসাই আমার দিন কি যাবে এই হালে, অথবা গৌর কি আইন আনলে নদীয়ায়, দয়াল নিতাই আমার ফেলে যাবে

না-এই সকল গান থেকে কী প্রমাণিত হয়? শ্রীকৃষ্ণ, গৌর গোবিন্দ, নিতাই, গুরু গোঁসাই-এসব নিয়ে যার ভক্তির দরিয়া রসরতির কামক্রীড়ায় সর্বদা তরঙ্গমুখর হয়ে থাকে, ইসলাম থেকে তার অবস্থান যে কত দূরবর্তী , তার ভূমিকা যে কত সাংর্ঘষিক, তা নিয়ে বির্তকের অণুমাত্র অবকাশ নেই।

অনেকে বলবেন, লালনের যে বিশাল দর্শন, সঠিক অনুধাবন মতার অভাবহেতু আমি তার গভীরে প্রবেশ করতে পারিনি। আসলে দেহ থেকে দেহাতীতের দিকে যাত্রা, সসীম দেহভান্ডান্ডের মধ্যে অসীম ব্রহ্মান্ডের অনুসন্ধানই লালনের দর্শন মহিমা। এর সঙ্গে সাধারণ যৌনতার সম্ভাবনা অত্যন্ত ীণ। যেহেতু ভক্তির দ্বারে বাধা আছেন সাঁই, তাকে পরম ভক্তিভাব নিয়ে দেহকে পূজার নৈবদ্য করে সমর্পণ করাই তো সাধনসিদ্ধির একমাত্র উপায়। এই উপায়েই হাওয়ার ঘরে চোরকে বশে আনা যায়, দৃষ্টিগোচর হয় রসসমুদ্রে ভাসমান সোনার মানুষ মনের মানুষ ও গুরু গোসাঁইয়ের অটল রুপশ্রী। দেহটা উপকরণ মাত্র, ল্যটা অনেক দুরের জিনিস। অতএব না বুঝে লালনকে অভিযুক্ত করা খুবই অসমীচিন, খুবই অর্বাচীনতা।

আমার অমতা আমি স্বীকার করি। এত দূরের জিনিস এত গভীর জিনিস আমার পে অনুধান করা সত্যই অসম্ভব। ড. আবুল আহসান চৌধুরী তার লালন শাহ গ্রন্থে অনেক দেখে শুনে ভেবে চিন্তে খুব অকপটে ও নির্মোহচিত্তে বলেছেন, বাউলের সাধনায় যোগতন্ত্র মৈথুন ও সহজ সাধনার ধারা এসে মিলছে এবং প্রফেসর চৌধুরী বাউলদের নিখাদ পরিচিতি সম্পর্কে কিন্তু সুচিন্তিত চুড়ান্ত কথাটিও উল্লেখ করেছেন, বাউলেরা রাগপন্থী। কামাচার বা মিথুনাত্মক যোগ সাধনই বাউল পদ্ধতি।

ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী বা ডঃ আহমদ শরীফ তারা কেউই লালনের মর্তবা ও গুপ্ত ঐশ্বর্যের আধ্যাত্মিক মহিমা নিয়ে অন্য অনেকের মতো একপেশে কথা বলতে চান নি। তারা লালনের সর্বতোমুখী পরিচয়, ভালো-মন্দ উভয় নিয়েই পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন। তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ। তাদের নিরপেক্ষ মতবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট যে, লালন আসলে ছিল একজন

কামাচারী ও মিথুনাত্মক সাধনার গুরু গোসাঁই, অশিষ্ট অভিধায় একজন প্রকৃত লম্পট। আর আমি যেহেতু নিরপেক্ষ নই, ধর্ম নিরপেক্ষও নই; আমি যেহেতু রাসূল (সাঃ) এর পথ নির্দেশকেই চূড়ান্ত বিবেচনা করি, আমার পক্ষে জেনেশুনে লালনের বিপজ্জনক অনিষ্টকারিতার সম্মুখে নির্বাক মৃতের মতো ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। এই ধরণের নিরবতা ইসলামের দৃষ্টিতে গুরুতর ও অমার্জনীয় অপরাধ, রীতিমত কবিরা গুণাহ। অতএব, চারিচন্দ্রভেদের এই দিশারী ত্রিবেণীতে মিন ধরা এই গুরু সাধক যে "রসরতি" "নীর-ক্ষীর" বা "রজঃশত্র " নাদ বিন্দুর গুপ্ত তত্ব নিয়ে এক মরমিয়া আবহ সৃষ্টি করে, আমরা তাকে মিথুনাত্মক এক গূঢ় সাধন প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করতে পারি; আমরা বলতে পারি, অদীক্ষিতের কাছে এটা যাই মনে হোক, আসলে এই দেহবাদের অন্তঃস্থলে রয়েছে অসীম অনন্ত এক আধ্যাত্মিক পিপাসা ও যুক্তি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যত যাই বলি, বস্তুত এটা এক চূড়ান্ত ভ্রান্তি ও কুৎসিত যৌনাচার ও কামাকীর্ণ অশ্লীলতা। এবং এটা আরো বেশী মারাত্মক এই জন্য যে, নিষিদ্ধ কামক্রীড়ার প্রতি মানুষ এমনিতেই বড় দুর্বল। তদুপরি সর্বতোভাবে হারাম এই প্রিয় কর্মটি যদি সম্পূর্ণ হারাম হওয়া সত্বেও ধর্মের ছদ্মবেশে সজ্জিত হয়, পরিধান করে হকিকত-তরিকতের কপট আলখাল্লা, তাহলে সেটা কত যে বিপজ্জনক, ইসলামকে যারা নুন্যতম মাত্রাও ভালবাসেন তাদের উচিত এটা অনুধাবন করা।

কোন কোন ধর্মে আছে, মানুষের তৃপ্তি দান আসলে স্বয়ং নারায়নকেই সুখী করা; কারণ অলক্ষ্যে স্বয়ং নারায়নই তৃপ্তিলাভ করেন, অতএব এটা বিশুদ্ধ পূর্ণকর্ম। কিন্তু আমাদের আলোচ্য লালন এক্ষেত্রে আরও অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে লাভ করেছেন পূর্ণ কামিয়াবী; যিনি কিছু মানুষকে প্রায় অকেশে বোঝাতে সম হয়েছেন যে, এই গুপ্ত শরীরী ফাঁদের এতই মেঘচুম্বী মহিমা যে, অধর চাঁদ, শুধু নিকট অলক্ষ্যে থেকে তৃপ্তি সুখই সম্ভোগ করেন না, ত্রিবেণীসঙ্গমে সশরীরে দৃশ্যমান হয়ে হাওয়ার ঘরে তিনি ধরাও দেন। কারণ, ব্রহ্মবিষ্ণু নর-নারায়ণ সেই ফাঁদে পড়েছে ধরা। প্রকৃত পক্ষে লালন যে মিথুনাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে বিরাট কিছু রয়েছে বলে বলে আমাদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার সাঙ্গীতিক ও পারিভাষিক রূপ যত রহস্যময়ই হোক, আসলে তা লাম্পট্য। এবং পুরো লালনগীতির আদ্যোপান্ত এই লাম্প্যটেরই কথা কথা, যা কোন মুসলমানের কাছে প্রশয় পেতে পারে না।

আল্লাহ পাক বলেন, ওয়ালা তাকরাবুজ্জিনা ইন্নাহু কানা ফাহিশাতান ওয়া ছাআ ছাবিলা অর্থাৎ তোমরা জ্বিনার নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয়ই এই অশ্লীলতা ও কুপথ। এই কুকর্মটি এতই ভয়াবহ যে, পবিত্র বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে, প্রকাশ্য ব্যভিচার কেয়ামতের একটা অন্যতম আলামত।

অথচ যত সুভাষণই প্রয়োগ করি, যত কথাই বলি, লালনের সর্বাত্মক সাধনার মূল কেন্দ্রই হলো ব্যভিচার; ইসলামী বিধানে যে ব্যভিচার বা জ্বিনার শাস্তি হলো নিপ্তি প্রস্তরাঘাতে প্রাণদন্ড। অতএব যে মুসলমান ইসলাম থেকে পুরোপুরি খারিজ হয়ে যেতে চান না, তিনি কি স্বপ্নেও কখনো লালনকে সুফী বা আউলিয়া বা মরমী মহাসাধক বলে ভাবতে পারেন!

অথচ কি দুর্ভাগ্য আমাদের আল্লাহপাকের পথ নির্দেশ ও রাসূল (সাঃ) এর জীবনাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত এ মুশরিক ও বিদআতীকে, আমরা গভীর অনুরাগে গ্রহণ করলাম মারেফাত জগতের এক সুফীতাত্বিক রাহবাররূপে। মুসলমানের কলব কতখানি ব্যাধিগ্রস্থ হলে এই রকমের বেশরম অশ্লীলতাকে আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় বলে বিবেচনা করতে পারে, সপ্রীতি প্রশ্রয় দিতে পারে, সে সত্যই ভেবে দেখার মতো একটি জরুরী বিষয়।

পুনরায় উল্লেখ করি, অনেকের বিবেচনায় লালন একজন খুবই উচু মর্যদার সুফী সাধক। আমরাও বলি, তিনি একজন অত্যুচ্চ মাকামের সুফীই বটে। কিন্তু সেই উচ্চ মার্গীয় মাকামটা যে কি জিনিষ, আল্লাহপাক ভালো জানেন। তবে আমরা যেটুকু দেখি তাতে বুঝতে পারি, এই গোসাঁইগুরু কামালিয়াত এতটাই হাসিল করে ফেলেছেন যে, তিনি কামের ঘরে কপাট বন্ধ করে কামক্রীড়ায় অটল রূপে বিহার করতে জানেন। শুধু তাই নয় গোপনাঙ্গের রঙমহল ঝলক দেয়া থেকে শুরু করে শুদ্ধ প্রেমরসের রসিক ত্রিবেণীতীর্থে প্রেম ডুবারু এই লালন যে আরো যে বহু অকথ্য করণ কারণ এরই এক অপরাজেয় গ্রান্ড মাষ্টার, সে বিষয়েও রসিকজনেরা সম্যক ওয়াকিবহাল। এবং আমরাও অস্বীকার করবো না, কামলোলুপতা অশ্লীল যৌনাচার যদি

কামালিয়াত হয়, তাহলে লালন অবশ্যই একজন বড় মাপের কামেল পুরুষ, আধ্যাত্মবাদের এক মহানায়ক।

কিন্তু ইসলাম কি বলে? ইসলামের অকাট্য ও স্বাভাবিক অনুশাসন থেকে আমরা কি পাই? ইসলাম কারো জন্যই কোন কারণে কোন অবস্থাতেই সুক্ষ্মতম অশ্লীলতাকেও অনুমোদন করে না। পাক নাপাক শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নটি ইসলামে একটি গুরুতর প্রশ্ন; যে কারণে মাহরাম পুরুষ ছাড়া একাকী কোনো নারীর পক্ষে কারও সঙ্গে বসাই নিষিদ্ধ, মুসলমানের জন্য নির্জন বাথরুমেও নগ্ন হওয়া নিষেধ, এবং সামান্য বায়ু-নিঃসরিত হলেও তাকে পুনরায় অজু করে পবিত্র হতে হয়।

কিন্তু কি আফসোস, অনেক মুসলমান আজ এতটাই গাফেল ও আত্মবিস্মৃত যে, লালনের চুড়ান্ত অশ্লীলতাকেও পরম শ্রদ্ধায় মনে করছে মুক্তির পথ ও পাথেয় এক অমূল্য আধ্যাত্মিকতা। অথচ এই গ্রান্ডমাষ্টার কামেল সম্পর্কে তার জীবদ্দশাতেই লেখা হয়েছিল, সাধুসেবা নামে লালনের শিষ্য ও তাহার সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাভিচার চলে। যা আজও বিদ্যমান।

আসলে লালনের পুরো ধর্মকর্মই হলো ব্যভিচার নির্ভর। লালন যে গূঢ় আধ্যাত্মিকতার কথা বলে, সেখানে আছে টলে জীব অটলে ঈশ্বর, আছে সে অটলরূপে উপাসনা, সে ভাব কেউ জানে কেউ জানে না। অথবা অটলকে চিনতে পারে কোন জনা। অন্য কিছু নয়, এখানে যৌনমিলনকালে পুংবীর্যকে ধারণ করে রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং অটল সাধনার নামে নানা ধরণের অস্বাভাবিক নোংরা যৌনাচারই হলো লালনের গুপ্তভেদ গুপ্তমন্ত্র ও সাধনপ্রক্রিয়া। যারা ইসলাম একেবারেই না মানে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যার মধ্যে ইসলামের সামান্য নামগন্ধও অবশিষ্ট আছে, তার পক্ষে কি এই ধরণের নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়সেবাকে মহৎ বলে মেনে নেয়া সম্ভব? আর শুধু ইসলামের কথা বলি কেন, পৃথিবীর কোন ধর্মই কি এই ধরণের কামাচারকে ভালো চোখে দেখে বা দেখতে পারে? এতদসঙ্গে উল্লেখ করি, নরনারীর যৌনমিলনের মধ্যেই যেহেতু লালনের মোক্ষ নিহিত, যুগলভজনই হলো লালনের সকল সিদ্ধিসাধনার উর্বর কৃষিক্ষেত্র। অবশ্য লালনকে অধিকাংশ সময়ই তার প্রকৃত রূপে শনাক্ত করা কঠিন হয়; কারণ

এই কবি সর্বদায় এক আপাত-নির্দোষ পরিভাষায় আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। উদাহরণতঃ লালনের একটি বিখ্যাত গানের কথা "সময় গেলে সাধন হবে না" ; এখানে সময় অর্থ মহাযোগের মূহুর্ত। আর এই মূহুর্তটির শুভাগমন ঘটে নারীদেহে রজঃস্রাবের প্রথম তিনদিনের মধ্যে; যে কারণে লালন বলে, ও সে তিন দিনের তিন মর্ম জেনে একদিনেতে সেধে লয়।

সত্যিই লালনের কোন তুলনা হয় না। এবং এটাও সত্য যে, ইবলিসের সার্বক্ষণিক ও প্রত্যক্ষ সহায়তা না পেলে এত নিপুণভাবে কেউ কখনো কদর্য যৌনাচারকে ধর্মের মোড়কে লোকসমক্ষে সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পারে না।

অবশ্য লালনকে নিয়ে এত বিস্তর কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না, যদি এই মহাপুরুষকে ঘিরে আমাদের ঈমান ও আকীদা বিধ্বংসী একটি কুৎসিত আবহ গড়ে না উঠতো। আমাদের দুর্ভাগ্য, যে ব্যক্তি মুসলমানই ছিলেন না, যার মধ্যে ইসলাম বলে আদৌ কোন পদার্থ ছিল না, যার গানের পারিভাষিক চোরাপথে শুধুই অশ্লীল ইঙ্গিতের ছড়াছড়ি, যার মরমিয়া পয়গাম হলো নিখাদ যৌনতার কথকতা, কি বদনসীব আমাদের, তাকেই আমরা কেউ কেউ আউলিয়া ভেবে বিভ্রান্ত হতে ভালবাসি। এবং এক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্টপোষকতা, প্রচারমাধ্যমসমূহের অত্যুৎসাহী ভূমিকা এবং সর্বোপরি ইসলামের ঘোরতর দুশমন কিছু মতলবী অসম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবির মানবপ্রীতি আজ লালনকে এমন এক শীর্ষবাসী মহৎ-এ পরিনত করেছে, যা এমনকি বহু আলেমকেও কিয়ৎপরিমান বিভ্রান্ত করছে। এই বিভ্রান্তির শুরু, পূর্বে উল্লেখ করেছি, অনবধানবশত পাকিস্থান আমল থেকে, যে কারণে জানাযা ও দাফন কাফন বিহীন অবস্থায় লালনের দেহটি যে গহ্বরে রতি, তার উপরে সযত্নে নির্মিত হয়েছে হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া *(রহঃ)* এর পবিত্র মাযার-এর অনুকরণে এক বিশাল মনোরম স্মৃতিসৌধ। সমাধি না বলে গহ্বর বলছি এই কারণে যে, লালনের মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশিত হিতকরী পত্রিকার একটি সংখ্যায় এই প্রামাণ্য তথ্য বর্তমান যে, তার কোন জানাযাও হয়নি, দাফন কাফনও হয় নি, একটু শুধু হরিনাম কীর্তন হয়েছিল। এবং এই জনশ্রুতিও বর্তমান যে, লালনকে গহ্বরস্থ করা হয় উত্তর দক্ষিণ নয়, পর্ব-পশ্চিমে লম্বাভাবে। হিতকরীর এই সংখ্যাটি যেহেতু লালনের মৃত্যু বৎসরেই প্রকাশিত, উল্লেখিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে বর্ণনা তার বিন্দুমাত্র তথ্য বিভ্রাট নেই। বিশিষ্ট লালন বিশেষ্ণ বসন্ত রঞ্জন পালও বলেন, এটা সর্বৈব সত্য। কিন্তু

দুঃখজনক যে এই বিষয়টি ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী ছাড়া আর কেউ আমাদের গোচরীভূত করেননি। কেন করেন নি তার দুটি জবাব হতে পারে। হয় আমাদের গবেষকগণ হিতকরীর এই প্রামাণ্য তথ্যটি সম্পর্কে আদৌ ওয়াকিবহাল নয়, না হলে লালনকে আউলিয়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করার মতলবী উদ্দেশ্য নিয়ে তারা সত্যকে গোপন করতে চান।

কিন্তু এই ভূমিকা বড় নিন্দার্হ, বড় অমার্জনীয়। কারণ মহৎ কি কুৎসিত যে উদ্দেশ্যই থাক, কিন্তু মানুষের অসাধুতার কারণে বহু মুসলমানের ঈমানে ও তওহীদি চেতনায় শিরক ও বিদআতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুতর।

বলা প্রয়োজন, আমার এই রচনার দ্বিতীয় কোন ল্য নেই। আমি শুধু বাংলাভাষী মুসলিম মিল্লাতকে এক গুরুতর ঈমানী বিপর্যয় থেকে সতর্ক করতে চেয়েছি। আশা করি, কেউ কেউ নিশ্চয়ই আল্লাহপাকের অনুগ্রহে এই বিভ্রান্তি ও গর্হিত ফিতনা থেকে সতর্ক হবেন। কিন্তু এতদসঙ্গে এই আশংকাও করি যে, যারা ইসলামের তি সাধনে তৎপর, মুসলমানকে যারা শিরক ও বিদআত এবং অশ্লীলতায় নিমজ্জিত করতে প্রতিশ্র "তিবদ্ধ, আমার এই আলোচানার কারণে লালনকে তারা একটি মোম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দ্বিগুণ উৎসাহে তৎপর হয়ে না উঠে। এই ধরণের অশ্লীলতাপ্রেমী লালন বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহপাক পৃথিবীতে কি শাস্তি উপহার দেবেন বা আদৌ দেবেন কিনা জানি না; তবে এটা জানি ইসলাম যেহেতু আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম , বিদআত ও অংশীবাদ যেহেতু ইসলামের এক নম্বরের দুশমন, সুতরাং এই লালনে নিমজ্জিত ইসলামদ্রোহীদের আপ্যায়নের জন্য আখেরাতে অপো করছে এক ভয়াবহ অগ্নিকুন্ড, জাহান্নাম। তবে ঈষৎ সান্তনার কথা, তাদের সঙ্গে ঘণিষ্ঠ সাথী হিসেবে ত্রিবেণীতীর্থ মানবদেহরূপ আদি মক্কার মহান সাধক লালন সাঁইও থাকবেন।

আলোচনা অধিক দীর্ঘায়িত করার আবশ্যকতা নেই। কারণ আমি যা বলতে চেয়েছি বা চাই, তা নিশ্চয়ই পাঠকের কাছে অল্পাধিক পৌছাতে সম হয়েছি। আমি চাই, আখেরাতের প্রশ্নে, মুসলমানের সঠিক অভিজ্ঞান রার প্রশ্নে, আমরা যেন লালনের কুহক ও কুহেলিকা উপো করতে পারি। "নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অত্যন্ত দুর্বল" *(সুরা নিসা)*। যারা বলেন লালন বস্তুত

অশ্লীলতার প্রবক্তা নয়; যারা বলেন লালনের যৌনতা একট্ িবিষয় বটে, কিন্তু লালন যৌনতাকে উত্তীর্ণ করেছেন এক উচ্চ মার্গীয় নান্দনিক আধ্যাতিœকতায়, দেহকে পরিণত করেছেন এক দেহাতীত সৌরভে; এবং তিনি নিজেও ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছেন এক মরমিয়া সিদ্ধ পুরুষে, তাদের কথা একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়। হয়তো তাই। কিন্তু আমার মনে পড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি কৌতুকজনক কেসের কথা। প্রকাশ্য স্থানে আপত্তিকর অবস্থায় এক যুবক-যুবতী পুলিশের হাতে পাবলিক নুইসেন্স এক্টে গ্রেপ্তার হয়েছিল। তাদেরকে যখন আদালতে হাজির করা হলো, যুবতীটি কিছুমাত্র লজ্জিত কি বিচলিত না হয়ে সপ্রতিভ কন্ঠে বললো, আমি দেহ বিক্রয় করি নি, আমি বিক্রয় করেছি জন্মনিয়ন্ত্রক কনডম, তবে তা *Practical Demonestration* সহ।

লালনও এই মহিলার মতো; তারও কথা, এটা যৌনতা নয়, এ এক গুপ্ত আধ্যাত্মিক জগত। তবে এই জগতে প্রবেশদ্বার হলো নরনারীর মিথুনক্রিয়া; এবং অবুঝ অরসিকেরা যাকে নিন্দা করে, সেটা হলো মূলতত্ব ও সাধন জগতের *Practical Demonestration*, আফসোস! আত্নঘাতী কিছু মুসলমান এই নোংরা আধ্যাত্মিকতার উপরও আস্থা স্থাপন করে। অধঃপাতের একটা সীমা আছে; কষ্ট হয়, মুসলমান আর কত অধঃপতিত হবে?

-